قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন

আস্-সাহাব মিডিয়া- এর পরিবেশনায়

উস্তাদ আহমেদ ফারুক

(তানজীম আল-কায়দা পাকিস্তানের দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান) -এর সাথে সাক্ষাৎকার

(প্রথম পর্ব)

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾

"আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ্ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা নিসাঃ আয়াত ৮৪]

আস্-সাহাব মিডিয়া- এর পরিবেশনায়

উস্তাদ আহমেদ ফারুক (*আল্লাহ্ ﷻ তাঁকে হিফাজত করুন*)

(তানজীম আল-কায়দা পাকিস্তানের দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান) -এর সাথে সাক্ষাৎকার।

প্রথম পর্ব

(সাক্ষাৎকারটি উর্দূ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে)

আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন

আস্‌-সাহাবঃ *বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রসূলুল্লাহি ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহি আজমা'য়িন।*

আজ আমরা উস্তাদ আহমেদ ফারুকের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়েছি, ওস্তাদ আহমেদ ফারুক হচ্ছেন পাকিস্তানের তানজীম আল-কায়দার দাওয়াহ্‌ বিভাগের প্রধান আর আজ প্রথমবারের মত তানজীম আল-কায়দার কোন নেতার সাথে উর্দূ ভাষায় আস-সাহাবের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। আজ এই সাক্ষাৎকারের প্রথম অংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে আমরা সারা বিশ্বজুড়ে জিহাদ এবং এর ফারযিয়াতের বিষয়ে বিভিন্ন সংশয় নিয়ে আলোচনা করবো ইন্‌শাল্লাহ। সবার আগে আমরা উস্তাদ আহমেদ ফারুকের কাছ থেকে তানজীম আল-কায়দার পরিচিত জানতে চাইবো।

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ *আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রসূলুল্লাহি ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহি আজমা'য়িন।*

অতঃপর বিয়ষ হচ্ছে ...

তানজীম কায়দাতুল জিহাদ যা সারা বিশ্বে আল-কায়দা নামে পরিচিত। এটি পুরো দুনিয়া থেকে ফিত্‌নাকে নির্মূল করা, আল্লাহ্‌ ﷻ -র কালেমাকে সবার উপরে তুলে ধরা এবং খিলাফত 'আলা মিনহাজুন নবুয়াতকে ফিরিয়ে আনার জন্য জিহাদের একটি তানজীম যার আমীর হচ্ছেন শাইখ ওসামা বিন লাদেন [আল্লাহ্‌ ﷻ তাঁকে সকল খারাপ কিছু থেকে হিফাজত করুন, জিহাদের এই পথের উপর দৃঢ় থাকার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের উপর তিনি বরকত দান করুন]। মূলতঃ এর পরিচিতি এতটুকুই তবে আল-কায়দার পরিচয় দেয়ার আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হল, এখন এটি কেবল একটি তানজীমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, যেখানে কিছু অনুসারী ও সমর্থক থাকে, বরং এটি এখন একটি মানহাজের নাম। যেখানেই কুফ্‌ফারদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও জিহাদের কথা শোনা যায়, যেখানেই তাওয়াগীতদের চোখের উপরে চোখ রেখে তাদেরকে উত্তেজিত করার কথা শোনা যায় এবং যেখানেই এই উম্মতের মুক্তি ও এর পক্ষে ক্বিতালের কথা শোনা যায়, সেখানে একই সাথে আল-কায়দার নাম চলে আসে। তাই জিহাদ এবং আল-কায়দা এই দু'টি শব্দ এখন একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করলে এটি এখন আর গতানুগতিক কোন তানজীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং উম্মতের পক্ষ থেকে যে কেউই শরয়ী মানহাজ অনুযায়ী ক্বিতাল করবে, সে দুনিয়ার যেখানেই অবস্থান করুক অথবা যে নামেই কাজ করুক না কেন, তাঁরা আমাদের থেকে এবং আমরা তাঁদের থেকে এবং এ বিষয়ে শেষ কথা হল যখন আমরা তানজীম নিয়ে আলোচনা করছি, এটি তো এই যুগের নাজেলাতুন মিনান নাওয়াজেল, কারণ বর্তমানের মুসলমানদের উপর এমন শাসকেরা এসে চেপেছে যারা নিজেরা তো জিহাদের দায়িত্ব পালন করছেই না,উল্টো তারাই জিহাদের পথে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা না হলে এটি শুধু কোন তানজীমের একক কোন ফারযিয়াত নয়,বরং এই ফারযিয়াত হচ্ছে পুরো খিলাফতের বা মুসলিম শাসকের উপর। এই বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে শুধু এই ফরযকে আদায় করার উদ্দেশ্যেই আমরা তানজীম আকারে একত্রিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি, অন্যথায় আমরা নিজেদেরকে এই উম্মতেরই একটি অংশ মনে করি আর কোন ব্যাপারেই নিজেদেরকে আলাদা মনে করি না। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌ ﷻ আমাদের পরিচয় দিয়েছেন,

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

"তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।" [সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৭৮]

আর ঠিক একইভাবে আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম ও মুসলিম জাতির একটি অংশ এবং এর মুক্তির জন্যই আমরা জিহাদ করে যাচ্ছি।

আস-সাহাবঃ আল-কায়দার ব্যাপারে সাধারণদের মধ্যে বলতে শোনা যায় যে, এটি শুধু আরব ভিক্তিক একটি তানজীম। তাহলে পাকিস্তানের মানুষ এখানে কিভাবে অন্তর্ভূক্ত হল?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ এ ব্যাপারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, যাঁরা এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই এখন শহীদ হয়েছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই আরবদের মধ্য থেকে ছিলেন আর এখনও আল-কায়দার বড় একটি অংশ আরব মুজাহিদীনদের মধ্য থেকে আছেন। কিন্তু এটি না এর পরিচিতির কোন অংশ আর না কোন শর্ত এর সাথে শরীক হওয়ার জন্য, এ বিষয়ে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে, এটি হচ্ছে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ক্বিতালরত একটি মাজমু'আর নাম। তাই যে কেউই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদার উপর কায়েম আছেন, শরয়ী হুকুম মোতাবেক জিহাদের ফারযিয়াত আদায় করে যাচ্ছেন তিনি এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন। তিনি যে কোন গোত্রের, বংশের অথবা এলাকারই হোন না কেন, ইসলামে তো আমাদেরকে এ ধরনের পার্থক্য শেখানো হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আল-জাজায়ের (আলজিরিয়া) মধ্যেও আল-কায়দা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যেও আল-কায়দা কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও যদি আমরা দেখি যারা আমেরিকায় আছেন অথবা ইউরোপে বা অস্ট্রেলিয়ায় কিংবা ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অথবা বিশ্বের অন্য কোনখানের মুসলিমরা এর সাথে সামিল রয়েছেন। এখানে সব জায়গা থেকেই মানুষ শরীক হচ্ছে আর ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের মানুষও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার মত কোন কিছুই নেই।

আস-সাহাবঃ এইমাত্র আপনি যাদের বিষয়ে উল্লেখ করলেন, তাদের ব্যাপারে জিহাদের পথকেই কেন আপনারা বেছে নিয়েছেন?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ দেখুন! এটি তো আমাদের নিজস্ব মনগড়া কোন সিদ্ধান্ত নয়, আল্লাহ্‌ ﷻ -র গোলাম ও বান্দা হিসেবে আমরা এই দুনিয়াতে জীবন-যাপন করছি, এটি এমন এক ফরয ইবাদত যার জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছি, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ﷻ বলেছেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" [সূরা যারিয়াতঃ আয়াত ৫৬]

সুতরাং আল্লাহ্ ﷻ আমাদেরকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনি ভাবে আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র শারিয়াহ্ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে থাকি, ঠিক একই ভাবে আল্লাহ্‌র কালেমাকে কিভাবে সবার উপরে তুলে ধরা যায় এবং নবুয়তী পন্থায় কিভাবে আবার খিলাফত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যায়- এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমরা শারিয়াহ্ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে থাকি। শারিয়াহ্ থেকেই আমরা জানতে পারি ও দিক-নিদের্শনা পাই যে, জিহাদের মাধ্যমেই এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব। জিহাদের আহ্‌কামের বিষয়ে শারিয়াহর বহু জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং আমাদের পূর্ববর্তী সালাফ ও খালাফদের আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, কিছু পরিস্থিতিতে জিহাদ হচ্ছে ফারদুল কিফায়া আর কিছু পরিস্থিতে তা ফারদুল আইন- যার অর্থ হচ্ছে উম্মতের সকল মুসলিমের উপর তা ফরয। কেবল তারা ব্যতীত যাদের উপরে শরয়ী ওজর রয়েছে। যে পরিস্থিতে আজ আমরা জীবিত আছি এবং যার মধ্যে দিয়ে আমরা চোখ খুলেছি, বিশেষ করে বিগত কয়েক শতক ধরে যখন কুফ্ফাররা ইউরোপের এলাকাগুলোকে আমাদের কাছ থেকে জবর দখল করে নেয়া শুরু করল, তখন থেকেই ফুকাহাগণ এর ফারযিয়াতের বিষয়ে আলোচনা করে আসছেন এবং যে সকল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন তার আলোকে জিহাদ এখন ফারদুল 'আইন। ফুকাহাগণ যে সকল পরিস্থিতে জিহাদ ফারদুল 'আইন বলেছেন তা হলঃ

১) মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত জায়গাও যদি কুফ্ফাররা দখল করে নেয়।

২) মুসলিমদের থেকে কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলাকে যদি কুফ্ফাররা বন্দী করে ফেলে।

৩) অথবা মুসলিমদের শাসক যদি মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগী) হয়ে যায়, তাহলে তাকে সরানোর জন্য জিহাদ ফারদুল আইন হয়ে যায়।

আজ আমরা যদি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে যাই ,তাহলে এক দিক থেকে নয় বরং সব দিক থেকেই পূর্বের চেয়ে আরো জোড়ালোভাবে জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে গিয়েছে। আমরা জিহাদের রাস্তাকে কেন বেছে নিয়েছি? এ কারণই বেছে নিয়েছি যে, জিহাদকে আমরা আমাদের উপর ফারদুল 'আইন মনে করি, শুধু আমাদের উপরেই নয় ,বরং পুরো উম্মতের উপরেই জিহাদ এখন ফারদুল 'আইন। তাই আমরা আমাদের ফারযিয়াত আদায় এবং আল্লাহর আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যেই জিহাদ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি। আর এটিও আমি বলব, যে পরিস্থিতি বর্তমানে এই উম্মতের উপর দিয়ে যাচ্ছে সম্ভবতঃ ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অবমাননাকর পরিস্থিতির উপর দিয়ে এর পূর্বে মুসলিমরা কখনো অতিক্রম করেনি, যখন আমাদের ভূমিগুলোকেও আমাদের থেকে জোড় করে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে ,অথচ এমন একটি সময় ছিল যখন আমরা সারা দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ শাসন করেছি আর এখন এমন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যখন সারা দুনিয়ায় এক টুকরো ভূমিও খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে আল্লাহ্ ﷻ -র শারিয়াহ্ অনুযায়ী শাসন করা হচ্ছে ; আমাদের এক দু'জন ভাই নয় বরং হাজার হাজার মুজাহিদীন, দা'য়ী, আলেমগণ এমনকি আফিয়া সিদ্দীকির মত বোনরা (আল্লাহ উনাদেরকে মুক্তি দিন) পর্যন্ত কুফ্ফারদের কারাগারের মধ্যে বন্দী রয়েছে, যাদেরকে মুক্ত করা আমাদের উপর ফরয। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে আজ এই উম্মত এমন এমন পরিস্থিতির উপর দিয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে না এই উম্মত দেখেছিল আর না নীরবতার সাথে তা সহ্য করেছিল। উদাহরণত, আল্লাহর কিতাবের সাথে একবার নয় বার বার অবমাননা করা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ -যাকে আমরা আল্লাহ্ ﷻ -র পরে না অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসি অথবা সম্মান করি- তাঁকে অনবরত অবমাননা করা হচ্ছে। আর এতগুলো বিষয় একত্রিত হওয়ার পরও যদি আমরা জিহাদের জন্য না দাঁড়াতাম, তাহলে আল্লাহ্‌র আযাব আসার আশংকা ছিল। সুতরাং, এটিই হচ্ছে মৌলিক কারণ যেজন্য আমরা জিহাদের পথকে বেছে নিয়েছি।

আস-সাহাবঃ কিছু মানুষ যারা দাওয়াতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তারা বলে থাকেন যে, মুজাহিদীনরা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াহ ও তাবলীগের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ অবশ্যই না, এটি কিভাবে সম্ভব? আমি এর পূর্বেও বলেছি যে, আমরা তো আল্লাহ্ ﷻ -র হুকুমের গোলাম। আর যিনি আমাদের উপর জিহাদকে ফরয করেছেন তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

"হে ঈমানদার গণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারাঃ আয়াত ২০৮]

তাই ইসলামের মধ্যে যতগুলো আহ্কামাত রয়েছে, তা জিহাদই হোক অথবা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সবগুলোকেই আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করে থাকি। মুজাহিদীনদের তো মুসলিমদের থেকে ভিন্ন অন্য কোন আক্বীদা নেই। তবে প্রত্যেকটি হুকুম শারিয়াহ্ যেভাবে বর্ণনা করেছে এবং ফুকাহাগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে ঠিক ঐ অবস্থানেই রাখা উচিত। তাই দাওয়াহ-কে আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করে থাকি এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়টিও জানা থাকা উচিত যে, কিছু কিছু পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যখন জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে যায় আর দাওয়াহ্ হয়ে যায় তখন ফারদুল কিফায়া। আর যখন জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে যায়, তখন এমনই একটি বিশৃংখাপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপনীত হয় যে, সকল ফুকাহাগণ লিখেছেন তখন সন্তানকে তার পিতার কাছ থেকে, দেনাদারকে পাওনাদারের কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে, এমনকি স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকেও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদ যখন ফারদুল 'আইন হয়ে যায়, যখন এর সাথে অন্য কোন কাজ সাংঘর্ষিক হয় তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর আমরাও এই একই আক্বীদা পোষণ করি যে, দাওয়াহর কাজও করবো; যেমনিভাবে আপনার সাথে আলোচনার মাধ্যমে হচ্ছে এবং আপনিও যেই কাজের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছেন। আমরা মুজাহিদ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে দাওয়াহ্ পৌঁছিয়ে যাচ্ছি। এই দুয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, তবে যখন কোন প্রকারের বৈপরীত্য আসে অথবা সাংঘর্ষিক হয়, তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু যে বিষয়টিকে আমরা ঠিক মনে করি না, তা হল দাওয়াহ-এর কাজকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে আজ জিহাদ যে ফারদুল 'আইন তা রহিত হয়ে যায়। দাওয়াহ্ তো আমরা দিয়ে থাকি, প্রত্যেক মুজাহিদ যে যেখানেই আছেন সেখান থেকেই জিহাদের পাশাপাশি দাওয়াহ্ দেয়ারও চেষ্টা করেন। এটি তো এই আলোচনার একটি দিক গেল আর এই আলোচনার আরো একটি দিক হল যা ইমাম শারাখতী رحمه الله বলেছেন, "ক্বিতাল এই জন্য ফরয হয়নি যে শুধুমাত্র যুদ্ধ করা হবে, বরং এটি ফরয হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াহ্ পৌঁছানো হয়।" তাই ক্বিতাল স্বয়ং দাওয়াহ্-এর একটি মাধ্যম। তিনি এর পরে বলেন, "দাওয়াহ্-এর দু'টি ধরণ রয়েছে, এক ধরণের হচ্ছে তরোবারীর মাধ্যমে দাওয়াহ অর্থাৎ ক্বিতাল আর দ্বিতীয় প্রকারের দাওয়াহ্ হচ্ছে মুখের মাধ্যমে দাওয়াহ্ অর্থাৎ যাকে আমরা তাবলীগ বলে থাকি।" তিনি এর সাথে আরো উল্লেখ করেন যে, "মুখের মাধ্যমে দাওয়াহ্ অর্থাৎ তাবলীগ হচ্ছে ক্বিতালের চেয়ে সহজতর একটি কাজ। কেননা, ক্বিতাল হচ্ছে এমন একটি আমল যার দ্বারা নিজের জান ও মালকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়। কিন্তু তাবলীগের মধ্যে এমন কোন কাজ করতে হয় না। তাই আমরা এখন দাওয়াহর মধ্যে প্রথম ধরণটি করে যাচ্ছি যা বেশি কষ্টকর ও বিপদজনক কাজ এবং যার মধ্যে বেশি কুরবানী চাওয়া হয়। আর এ বিষয়টি শুধু তাঁর বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, ক্বিতাল ও তরোবারীর

মধ্যে আল্লাহ্ ﷻ দাওয়াহ্-এর এক আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া রেখেছেন। **১১ই** সেপ্টেম্বরের বরকতময় হামলার কথা স্মরণ করে দেখুন, এর পরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে বিপুল পরিমাণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা ইতি পূর্বে বহু বছর ধরে তাবলীগের কাজের মাধ্যমেও সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিছু সংখ্যক ভাইয়ের জীবনের কুরবানীর ফলে কুফ্‌ফারদের ভূমিতেই বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়া তলে আসার জন্য এক দাওয়াহর মাধ্যম তৈরি হয়েছিল। শাইখ ওসামা বিন লাদেন (আল্লাহ্ ﷻ তাঁকে হিফাজত করুন) এক আলোচনার মধ্যে একটি খুবই উত্তম কথা বলেছিলেন যে, "মাক্কী সময়ের মধ্যে এমন কিছু উত্তম দা'য়ী দাওয়াহ্ দিচ্ছিলেন যাদের মত এই আসমান ও যমীন পূর্বে না কখনো দেখেছিল আর না পরবর্তীতে কখনো দেখবে অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ হযরত আবু বকর رضي الله عنه, হযরত উমর رضي الله عنه, হযরত উসমান رضي الله عنه, হযরত আলী رضي الله عنه প্রমূখ সাহাবীগণ তখন দাওয়াহ্ দিচ্ছিলেন। সেখানে তের বছর যাবৎ দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর এক শত-এর কিছু বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু মৌখিক দাওয়াহর কাজ করা হচ্ছিল, আর ঠিক এর কিছুদিন পর অর্থাৎ মাদানী সময়ে যখন জিহাদকে ফরয করা হল এবং মক্কা বিজয় করা হচ্ছিল তখন যারা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল তাদেরকেও যখন রাসূল ﷺ-এর সামনে আনা হল এবং তাদেরকে প্রিয় নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল যে তিনি কেমন ব্যক্তি, তখন তারা উত্তরে বলতে লাগলো, 'আপনি একজন সম্ভ্রান্ত পিতার সম্ভ্রান্ত সন্তান'। এ জন্যই শাইখ উসামা (আল্লাহ্ তাঁকে হিফাজত করুন) বলেন, এ রকম কেন হল- যেই ইসলাম তাদের তের বছরের মৌখিক দাওয়াহর মাধ্যমে বুঝে আসে নি এখন তা অতি অল্প সময়ে কিভাবে বুঝে এসে গেল? তা এ কারণে হয়েছে যে, তরোবারী হক্ব কথাকে বুঝতে সহায়তা করে। কেননা মানুষের নফ্‌স সকল ক্ষেত্রেই এমন নয় যে শুধু প্রমাণ দেখেই দাওয়াহ্-কে কবুল করতে শুরু করে দেয়। যাদের নফ্‌স প্রশান্ত তারা এভাবে কবুল করে নেয়, তবে অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই তার নফসের কামনা-বাসনা, অহংকার এবং স্বেচ্ছাচারিতা তার উপরে বিজয়ী হয়, যার সামনে হক্বের পক্ষ থেকে প্রমাণ পেশ করার পরও বিভিন্ন ধরনের অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করে। তাই এ ধরনের মানুষের জন্যই যখন তরোবারী এসে পরে এবং শক্তির শুধু প্রদর্শনী করা হয়, এখানে গর্দনের আঘাত করার কথা বলা হচ্ছে না শুধু প্রদর্শনী করা হয়, তখন সে সহজভাবে দাওয়াহ্ কবুল করে নেয়। আর আমরা এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে দাওয়াহ্ থেকে আলাদা কোন কাজ করছি না, বরং দাওয়াহর রাস্তায় যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাই দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং 'দাওয়াহ্ বিল বানান' অর্থাৎ তরোবারীর মাধ্যমে যে দাওয়াহ্ দেয়া হয় তা চালিয়ে যাচ্ছি।

আস-সাহাবঃ আমাদেরকে আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন যে, আপনাদের শত্রু কারা অর্থাৎ কাদের বিরুদ্ধে আপনারা এই জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ বন্ধু এবং শত্রুর পরিচয় একজন মানুষের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে এর মধ্যে ধোঁকা খায় সে সারা জীবনই হোঁচট খেয়ে ফিরতে থাকে। আর এটি আল্লাহ্‌র রহমত যে তিনি আমাদেরকে এ ধরনের হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শত্রুদেরকে আমাদের কাছে চিনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শত্রু চিনিয়ে দেয়ার এই ধরণ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মানুষের জীবনে তার বন্ধু এবং শত্রুকে চেনা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আল্লাহ্ ﷻ শত্রুকে চেনানোর বিষয়টি তখন করেছিলেন, যখন আদম (আঃ) যমীনের মধ্যে নামেনও নি। আর তখনই তিনি তাঁকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন যে, শয়তান তোমার শত্রু, সে তোমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে, তাই তার কাছ থেকে সতর্ক থেকো। পরে যখন তিনি প্রতারিত হলেন তারপরেও আল্লাহ্ ﷻ

তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, মু'মিনের বন্ধু ও সাহায্যকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ ﷻ। তাই আল্লাহ্ ﷻ কুরআনের এক জায়গায় বলেন যে,

﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৬৮]

এবং তিনি অন্য আরেক জায়গার মধ্যে বলেন যে,

﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾

"আল্লাহ্র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ্ পরহেযগারদের বন্ধু।" [সূরা জাসিয়াঃ আয়াত ১৯]

তাই সর্বপ্রথম আমাদের বন্ধু হচ্ছে ঐ সত্ত্বা যাঁর উপর আমরা ভরসা করে থাকি, আর আমাদের শত্রু হচ্ছে সে যাকে শয়তান বলা হয়। এরপর আল্লাহ্ ﷻ আমাদেরকে শয়তানের চেলা-চামুন্ডা আছে তাদেরকেও চিনিয়ে দিয়েছেন। এবং এরপর আল্লাহ্ ﷻ আরো বলেছেন,

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾

"অথচ আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" [সূরা নিসাঃ আয়াত ৪৫]

তাই শত্রু কে আমি তা নিজে নির্ধারণ করতে পারবো না অথবা আমার নাফ্স কিংবা অন্য কেউই তা নির্ধারণ করতে পারবে না। এজন্য প্রত্যেক মু'মিন যে আল্লাহ্ ﷻ -র প্রতি ঈমান রাখে, তাকে আল্লাহ্ ﷻ, তাঁর কিতাব এবং রাসূলের ﷺ দিকেই প্রত্যাবর্তন করা উচিত। আমরা যদি তাঁর দিকে ফিরে যাই, তা হলে দেখতে পাবো যে তিনি আমাদের শত্রুদের ব্যাপারে এতোই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, শত্রুদের মধ্য থেকে স্তর করেও আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

"আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।" [সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৮২]

আল্লাহ্ ﷻ এখানে নাসারাদের তুলনায় ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এরাই হচ্ছে আমাদের সেই শত্রু অর্থাৎ ইহুদী, মুশরিক এবং অনেক ক্ষেত্রে নাসারা, যাদের বিরুদ্ধে আজ আমরা আমাদের ক্বিতাল চালিয়ে যাচ্ছি। এরা তো হচ্ছে বাহিরের শত্রু যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ﷻ -র অনুগ্রহে, রহমতে এবং নিয়ামতে বেশ কয়েক বছর যাবৎ দুনিয়ার বিভিন্ন ভূমিতে ক্বিতাল পরিচালিত হয়ে আসছে। যা পুরো দমে শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে ঘোষণার মাধ্যমে এবং এরপর থেকে এই ক্বিতাল এখন পর্যন্ত চালু আছে। যেমনঃ আমেরিকার সামুদ্রিক যুদ্ধ জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা, কেনিয়া ও তানজেনিয়ায় আমেরিকার এ্যাম্বাসিকে লক্ষ্য করে হামলা, আর ঠিক একই ভাবে ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকান ভূমিকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো এবং পরবর্তীতে ৭ই জুলাই লন্ডনে পরিচালিত হামলা অর্থাৎ এগুলো ছিলো তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের একটি ধারাবাহিকতা যা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়েছিল। এরপর চতুর্থ শত্রু হচ্ছে যার কথা কুরআনেও বহু জায়গায় এসেছে আর হাদিসেও বহু জায়গায় এসেছে এবং পূর্ববর্তী সালাফগণও তাদের লিখনীতে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা হল মুরতাদ্দ্বীন (দ্বীন ত্যাগী)। এদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন কারণ পূর্ববর্তী অনেক উলামাগণই তাদের বিষয় এতোটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তাদের শত্রুতাকে ইহুদী ও মুশরিকীনদের শত্রুতা থেকেও বিপদজনক বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন সাহেবে মাজমু'আ আল-আনওয়ারে মুরতাদ্দ্বীনদের বিষয়ে লিখেছেন, তরোবারী যাদের বিরুদ্ধে চালানো হবে তাদের মধ্যে মুরতাদ্দ্বীনের কথা উল্লেখ করে বলেন, মুরতাদ্দ্বীন হল কুফ্ফারদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাফের, কারণ তারা ঈমান আনার পরে দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং, বাহিরের এই তিন শত্রু আর ভিতরের এক শত্রু, যাদের বিরুদ্ধে আজ আমরা আমাদের ক্বিতালকে চালিয়ে যাচ্ছি। তাই যখন যে পরিস্থিতে যে শত্রুকে প্রাধান্য দিয়ে ক্বিতাল করতে হয় আমরা তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকি।

আস-সাহাবঃ যখন আফগানিস্তানে মুসলমানরা রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন আমেরিকা ও মুসলিম জাহানের এক বিশাল অংশ মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং অস্ত্র-সস্ত্র ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র দিয়ে সহায়তা করছিল, কিন্তু আজ যখন আমেরিকার সাথে মুজাহিদীনরা যুদ্ধ করে যাচ্ছে তখন তারা কোথা থেকে এ ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে এবং কি ধরনের অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা হচ্ছে?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ সত্যিকার অর্থে, এটি হচ্ছে অনেক গুলো মিথ্যা প্রপাগান্ডাগুলোর মধ্যে একটি খুব বড় ধরনের প্রপাগান্ডা যা সারা দুনিয়াতে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে আমেরিকার মিডিয়াগুলো নিজেরাই গুরুত্বের সাথে ছড়িয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, 'রুশের পতন আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারাই হয়েছে'-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তা শুধু এখানেই করা হয়নি বরং মুজাহিদীনরা যতগুলো বড় বড় কাজ করেছে তার প্রত্যেকটিতে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। হোক ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলায় অথবা অন্য কোন সময়ের কথা- তারা এই উম্মাতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে মুজাহিদীনদের দ্বারা এ ধরনের কাজ করা অসম্ভব অর্থাৎ মুজাহিদীনদের এত বড় কাজ করার সামর্থ্য নেই। যাতে করে এই উম্মাতের মধ্যে এর দ্বারা উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরী হতে না পারে এবং গোলামীর এই জিঞ্জিরকে ভাঙ্গার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন তা তৈরী হতে না পারে। এটিই হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য যার জন্য তারা বছরের পর বছর প্রপাগান্ডা চালিয়ে আসছে, কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, আফগানিস্তানে ১৯৭০ সালের শেষের দিক থেকে রুশদের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের জিহাদ শুরু হয়, তখন থেকে শুরু করে ১৯৮৫-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার মত কোন বহিঃশক্তি এর মধ্যে না কোন প্রকারের সাহায্য সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছিল আর না এ ব্যাপারে কোন প্রকার আগ্রহ তারা দেখিয়েছিল। সবাই ঐ সময়ে দূরে বসে বসে তামাসা দেখছিল, আর তারা মনে করছিল এটি একেবারে অসম্ভব ব্যাপার যে, এই সামান্য অস্ত্র দিয়ে এবং এত অল্প সংখ্যক মুজাহিদীনদের দ্বারা

রুশের মত এত শক্তিশালী বাহিনীর (যাকে দেখে তখন ইউরোপ পর্যন্ত কেঁপে উঠত) পতন ঘটানো হবে। এই দীর্ঘ জিহাদের যে সময় অতিক্রম হয়েছে তা খুবই কঠিন একটি পরিস্থিতির উপর দিয়ে গিয়েছে, আমেরিকা বা অন্য কোন তাগুতের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা তখন আসে নি। ঐ সময়ের বয়োজ্যেষ্ঠ মুজাহিদীনরা আজও পর্যন্ত এর সাক্ষ্য বহন করে আছেন। কেবল মুজাহিদীনদের কুরবানী, শহীদের রক্তের বিনিময় এবং আল্লাহ্ ﷻ -র নুসরাতের দ্বারাই ঐ জিহাদ এগিয়ে চলছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালের পর জিহাদ একটি অবস্থানে পৌছালো এবং আমেরিকার এর মধ্যে দাখিল হওয়া অথবা না হওয়া উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্র নুসরাত সেখানে জারি থাকারই কথা ছিল। এই অবস্থাতে আমেরিকা সেখানে আসলো, আমেরিকা এসেছিল তার নিজের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। প্রথমতঃ বিষয় ছিল আমেরিকা চাচ্ছিল না যে মুজাহিদীনদের এই বিজয় যাতে এমন কোন পরিস্থিতির দিকে যায় যা স্বয়ং আমেরিকার জন্য বিপদের কারণ হয়ে যায় আর দ্বিতীয়তঃ তখন রাশিয়া ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় শত্রু যার পতন সে চাচ্ছিল। তারপরও ঐ পরিস্থিতিতেও এ কথা বলা ঠিক হবে না যে আমেরিকা মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। শাইখ আব্দুল্লাহ্ আজ্জাম رحمه الله যিনি আরব মুজাহিদীন শাইখদের মধ্যে থেকে একজন খুবই উঁচুমানের শাইখ ছিলেন, তিনি ১৯৮৭-৮৮ সালের এক খুতবায় বলেন, "কোথায় সেই আমেরিকার সাহায্য যা লোকেরা বলে থাকে যে, আমেরিকা আমাদেরকে ষ্টেনগ্যান দিয়েছে, আমরা তো ষ্টেনগ্যান বাজার থেকে ক্রয় করি আর একটি ষ্টেনগ্যানের দাম হচ্ছে ৭০ হাজার টাকা।" ঐ যুগে ৭০ হাজার টাকা কোন সাধারণ কোন বিষয় ছিল না, শাইখ আজ্জাম رحمه الله বলেন, "৭০ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করা ষ্টেনগ্যান, তারা তো আর আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে না। এটি তো একটি ব্যবসা যা যে কারোর সাথেই করা যেতে পারে। তাহলে এর মধ্যে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়টি কোথায় রইল?" এছাড়াও যদি আরব মুজাহিদীনের কথা বলা হয় যাদের তখন একটি বড় ধরনের অবদান ছিল, তাহলে তাঁরা আমেরিকার কাছ থেকে কোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করে নি, তাদের এই কথার মধ্যে বিন্দু মাত্র সত্যের ছোঁয়া নেই, বরং পুরোটাই মিথ্যা ও বানোয়াট একটি বিষয়। তার পরেও যদি আমরা ধরে নেই যে, গুটি কয়েক ছোট মাজমুয়া তাদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েছিল, তাহলে তারা যদি শারিয়াতে কুফ্ফারদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার শর্তগুলোকে পূরণ করা ছাড়াই নিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তারা ভুল কাজ করেছিল। এ কারণে যে খারাপ ফলাফল হয়েছে অর্থাৎ জিহাদের ভূমি থেকে বরকত উঠে যাওয়া, এ বিষয়টিও সবাই লক্ষ্য করেছিল। যেমনটি শাইখ আব্দুল্লাহ্ আজ্জাম رحمه الله নিজেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, "১৯৮৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন আমেরিকা এই ভূমিতে প্রবেশ করেনি ততদিন পর্যন্ত এখানকার মুজাহিদীনরা অগণিত আল্লাহ্ ﷻ -র সাহায্য এবং কেরামত দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু ৮৬'সালের পরে যখন মুজাহিদীনদের থেকে কিছু লোক আমেরিকার দিকে ফিরতে শুরু করল আর তাও সরাসরি ছিল না পাকিস্তান অথবা সৌদি আরবের শাসকদের মাধ্যমে করা হচ্ছিল, তখন থেকেই জিহাদের ভূমি থেকে ধীরে ধীরে বরকত কমে যাওয়া শুরু করেছিল।" কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে সব মুজাহিদীনরাই এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়েছিল বরং গুটি কয়েক মাজমুয়া এ কাজ করেছিল। কারণ তখনও এমন অনেক আলেম-উলামা এবং মুজাহিদীন ছিলেন যারা তাদের হাতকে ঐ সকল লোকদের সামনে বিছিয়ে দেন নি। এর প্রমাণ হচ্ছে তাদেরই বংশধর থেকে আজ তাদের সন্তানেরা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে পুরো একটি কিতাব লিখেছিলেন "আফগান জিহাদের আর-রহ্মানের সাহায্য", যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন এ রকম বহু কেরামতের ঘটনা যা তখন সংঘটিত হয়েছিল।

এটি তো গেল আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের জবাব আর আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ তাহলে আজ আমরা কার সাহয্য নিয়ে জিহাদ করব? এর উত্তর হচ্ছে- যাঁর সাহায্যে আমরা কাল জিহাদ করেছিলাম আজও আমরা তাঁরই সাহায্যে জিহাদ চালিয়ে যাবো। আল্লাহ্ ﷻ -র

সাহায্যের প্রতি আমাদের পূর্বেও ভরসা ছিল আর ঠিক একই ভাবে এখনো ভরসা আছে। মু'মিনদের শুধুমাত্র আল্লাহ্ ﷻ -র উপরই ভরসা রাখা উচিত। আল্লাহ্ ﷻ বলেছেন,

"আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহ্র উপর ভরসা করুক।" [সূরা মুনাফিকূনঃ আয়াত ১৩]

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

"পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।" [সূরা আন-ফালঃ আয়াত ৬২]

অর্থাৎ মু'মিনদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাবো। তাই আল্লাহ্ ﷻ -র পর আমাদের দ্বিতীয় সাহায্যকারী হচ্ছে এই উম্মাত যারা আমাদেরকে ভালোবেসে এবং আমরাও যাদেরকে ভালোবাসি, তারা আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, যাদের দু'আ এবং জান ও মালের সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা আমাদের এই জিহাদ এখন পর্যন্ত জারি আছে।

আস্-সাহাবঃ জিহাদ ও মুজাহিদীনদের বিষয়ে যে সকল বিভ্রান্তি মূলক কথা শোনা যায় তার মধ্যে এটিও একটি যে, রুশের পতন হওয়ার পর এই জিহাদের ফলাফল কি অর্জিত হয়েছে? অর্থাৎ এর পরে মুজাহিদীনরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ও মুসলমানের মধ্যে খুন-খারাবী করা শুরু করে দেয়, তাহলে এ ধরনের কাজে কি লাভ হয়েছে?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ প্রথম কথা হচ্ছে, জিহাদের মধ্যে এই লাভ আর লোকসানের কথা এলো কোথা থেকে? আমি প্রথমেই বলেছি যে, আল্লাহ্ ﷻ -র তরফ থেকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করার জন্যই আমরা জিহাদ করে থাকি। আমরা তো নাউজুবিল্লাহ্! কোন কাফের জাতি যেমন বৃটিশ, জার্মানী অথবা ফ্রান্সের মত নই যে, ক্বিতাল অথবা যুদ্ধকে আমরা আমাদের রাজনৈতিক বিষয় এবং আমাদের নিজেদের হাতে সিদ্ধান্ত বলে মনে করবো, যা যখন আমাদের জাতির সুবিধা হবে তখন করবো, আবার যখন অসুবিধা হবে তখন বাদ দিয়ে দিবো। জিহাদ তো স্বয়ং আল্লাহ্ ﷻ -র পক্ষ থেকে নাযিল করা একটি হুকুম। যখন নামাজ, রোজা, যাকাত অথবা দাওয়াহ্ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ কথা বলা হয় না যে সুবিধা হলে কর না হলে ছেড়ে দাও, তা হলে জিহাদের ক্ষেত্রে কেন এমনটি বলা হয়ে থাকে? জিহাদের জন্য শারিয়াতের মধ্যে কিছু আহ্কামাত রাখা হয়েছে এবং কিছু পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে জিহাদ করা ফারদুল 'আইন আর এই পরিস্থিতি না থাকলে জিহাদ করা ফারদুল কিফায়া। এটি ফরয একটি দায়িত্ব যা আল্লাহ্ ﷻ -র পক্ষ থেকে আমাদের উপর আদেশ করা হয়েছে এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের তা পালন করা আবশ্যক কর্তব্য। দ্বিতীয় বিষয় হল, আসুন আমরা তর্কের খাতিরেই আলোচনা করি যে এই জিহাদের দ্বারা আমাদের কি লাভ হয়েছে, যদিও শারিয়াহ্ গত ভাবে এই আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই তারপরও তর্কের খাতিরে এর জবাব দিচ্ছি, রুশের বিরুদ্ধে জিহাদ করাতে এতটুকু লাভই যথেষ্ট যে, এই উম্মাহ্ খিলাফত ব্যবস্থার পতনের পর এমনকি এরও আগে থেকে জিহাদের রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ফারযিয়াতকে ছেড়ে দিয়েছিল, যে ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, যদি তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ্ ﷻ তোমাদের উপর অবমাননাকর অবস্থা চাপিয়ে দেবেন। তাই এতটুকু লাভই যথেষ্ট যে পুরো উম্মতের জন্য একটি ময়দান মিলে গিয়েছে যেখানে এসে হাজারো যুবক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল আর লক্ষ লক্ষ মুজাহিদীন আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের জীবন কুরবানী দেয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আগুনের এই বিস্ফোরণ পুরো

উম্মতকে জাগিয়ে তুলেছিল। মানুষ এখানে আফ্রিকা মহাদেশ, আরব মহাদেশ এবং এশিয়া মহা দেশ থেকে এসেছিল এবং মুজাহিদীনরা ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এসে এখানে একযোগে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ্ ﷻ -র ইচ্ছায় এর দ্বারা একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে অর্থাৎ রুশদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এর মধ্যে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলেছে। তাই এই একটি লাভই যথেষ্ট যে এই ঘুমন্ত উম্মতকে তারা জাগিয়ে তুলেছে। এর দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টি ভঙ্গি হচ্ছে, আমরা ইতিহাসের তারিখকে কেন এতটুকু পর্যন্ত এনে রেখে দেই যে, রুশরা আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার পর মুজাহিদীনদের কিছু দলের মধ্যে লড়াই সৃষ্টি হয়েছে -এটি তো একটি বেইনসাফী কথা যে আমরা ইতিহাসের সময়কে একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে এনে থামিয়ে দেব। ইতিহাসে তো এর পরেও আরো কিছু ঘটেছিল। এর পরে তালেবানদের প্রকাশ পাওয়া যা খিলাফতের পতনের পর প্রথমবারের মত দুনিয়ার জমীনের আল্লাহ্র শারিয়াহর পুরো-পুরিভাবে বাস্তবায়ন হতে দেখা গিয়েছিল, এটি সেই জিহাদের বরকত না হলে আর কি হতে পারে। কারা ছিলেন এই তালেবান? তাঁরাই ছিল যাঁরা রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে ছিল, অতপর যখন তারা দেখলো নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ শুধু বেড়েই চলেছে তখন তাঁরা তাদের ফরয দায়িত্ব আদায় করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখানে ইসলামিক ইমারাত কায়েম করলেন। তাই খিলাফতের পতনের পর প্রথমবারের মত তারা দুনিয়ার কোন প্রকারের বাধা বিপত্তিকে পরোয়া না করে আল্লাহ্ ﷻ -র হুকুমকে আল্লাহর জমীনের উপর কায়েম করলেন, যার মাধ্যমে আমাদের পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ ব্যাক্তিদের যুগের কথা আবার তাজা করেছিলেন। তারা পুরো দুনিয়ার উম্মতের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, যেখানে এসে কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে হামলার জন্য বড় ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায় এবং এই উম্মতের জন্য তা একটি বড় মারকাজের ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং, এতোগুলো সুবিধার মধ্য থেকে যে কোন একটি সুবিধাই যথেষ্ট ছিল এর জবাব দেয়ার জন্য যে, রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাতে কি লাভ হয়েছে। এছাড়াও যদি ছোট ছোট সুবিধাগুলো আমরা দেখতে চাই , তাহলে আমরা অসংখ্য সুবিধা দেখতে পাবো।

আস্-সাহাবঃ এই কথাও বলা হয়ে থাকে যে, এরপরে আমেরিকা আসলো এবং আফগানিস্তানের ইমারতকে ধ্বংস করে দিলো, তাই আজ মুজাহিদীনরা আমেরিকাকে নিঃশেষ করেও দেয়, তাহলে এর পরে হয়ত অন্য আরেক শক্তি যেমন চীন অথবা ফ্রান্স আসবে এবং তখন তাদের টেকনলজির বা বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামের মাধ্যমে ইসলামিক ইমারাতকে আবারও ধ্বংস করে দিবে। আসল বিজয় তো তাহলে টেকনলজি ও যুদ্ধ সামগ্রী যাদের বেশি তাদেরই হল। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ﷻ তো আমাদেরকে বলেছেন যে, "তোমরা তোমাদের সাধ্যতম শক্তি অর্জন কর।"-এটি অর্জন করাটাও তো মুসলমানদের দায়িত্ব। আর এর পরে যখন আপনার কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম মজুদ থাকবে তখন তো আর কেউ আপনার দিকে বাঁকা চোখে তাকানোরও সাহস পাবে না। তখন আপনি খুশি মনে জিহাদ করতে পারবেন- এই কথাগুলো অনেক সময়েই কিছু সুপরিচিত আলেম ও ফুকাহ্গণের কাছ থেকে শোনা যায়- এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ এর একটি দিক হচ্ছে, যে আয়াতটি আপনি এই মাত্র তেলাওয়াত করলেন, (সূরা আনফাল-৬০) এর শব্দ গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন আছে, মুফাস্সিরিনগণ এ বিষয়ে কিছু লিখেছেন তাও দেখার প্রয়োজন রয়েছে। *"মাস্তাতা'তুম"* অর্থাৎ **"যতটুকু তোমার সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব"**। মুফস্সিরিনগণ এ বিষয়ে দু'টি দিকের কথাই বলেছেন, এক হচ্ছে যতটুকু তোমার সামর্থ্যের মধ্যে করা সম্ভব হয় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে মোকাবেলা করার জন্য, তা ভরপুরভাবে ও সর্বশক্তি দিয়ে করার চেষ্টা কর এবং তার মধ্যে দ্বিতীয় দিক এটিও লিখেছেন যে, যতটুকু শক্তি অর্জন করতে পারো কর এবং ময়দানে নেমে যাও। তাই যদি আমরা এটি মনে করি যে, আমাদেরকে কাফেরদের মোকাবেলা করতে হলে তাদের সমপরিমাণ শক্তি অর্জন করতে হবে এবং একে জিহাদ করার জন্য পূর্ব শর্ত বানিয়ে নিই, তাহলে বলব এটি তো আমরা কোরআন অথবা হাদিসের কোন সুস্পষ্ট দলিল থেকে প্রমাণ পাই না। আমাদের কোন্ হুকুমটি

দেয়া হয়েছে, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করা, নাকি কাফেরদের চেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করা? তাই এই বিষয়টি আমাদেরকে প্রথমে পরিষ্কার থাকতে হবে যে, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ীই আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে। আর দ্বিতীয় বিষয় হল, যখন আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব এবং পরিস্থিতিও যদি মর্মান্তিক হয়, তাহলে আমাদের কাছে যা কিছুই আছে তা নিয়েই ময়দানে নেমে পরতে হবে। বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানের সামর্থ্য এতটুকুই ছিলে যে, তাঁরা সর্বমোট ৩১৩ জন সাহাবী ময়দানে নেমে আসতে পেরেছিল এবং গুটি কয়েক তরোবারী ও হাতে গোণা কয়েকটি সওয়ারী ছাড়া তাদের কাছে তখন আর কিছুই ছিল না, এছাড়াও যার হাতে যাই পেয়েছিলেন, যেমন- লাঠি-শোটা তা নিয়েই মাঠে নেমে পড়েছিলেন এবং তাঁরা তা দিয়েই কুফ্ফারদের সাথে মোকাবেলা করেছিলেন। আর এখানে তাঁরা সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জনের চেষ্টার কোন কমতি করেননি। যে ফরয হুকুম তাঁদের উপরে ছিল তাঁরা তা পূরণ করার জন্য ময়দানে নেমে পড়েছিলেন এবং তা পালনের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং আমাদের জন্য একটি সুন্নাত কায়েম করে দিয়েছেন। এর একটি ছোট্ট উদাহরণ যদি আপনাদেরকে দেই, তাহলে বিষয়টিকে বুঝতে আরো সহজ হবে, ধরুন! আপনার ঘরে চোর অথবা ডাকাত প্রবেশ করেছে, তাহলে কি আপনি তাদেরকে এ কথা বলবেন যে, ভাই তোমরা যখন এসেই পরেছো , তাই যা খুশি করার করে নাও অর্থাৎ ঘরের সব মালা-মাল, টাকা-পয়সা এবং ইজ্জত-সম্মান লুট করে নিয়ে যাও, আমাদের এতটুকু সময় দরকার, যাতে আমরা তোমাদের সমপরিমাণে শক্তি অর্জন করে নিতে পারি এবং এরপরে আমরা তোমাদের মোকাবেলা করব আর এখন তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো। এ ধরনের কথা শারিয়াতের পূর্বে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিরও বিপরীত। তাই যখন শত্রু কারোর উপরে আক্রমণ চালানোর জন্য চড়াও হয়; তখন শুধু মুসলমানই নয় বরং কাফেররা পর্যন্ত তার হাতের সামনে যা কিছু আছে তা নিয়ে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য শত্রুর মোকাবেলা করার চেষ্টা চালাবে। আমরা যদি মানব জাতির বাহিরের দিকে তাকাই, যেমনঃ যদি আমরা একটি ছোট্ট প্রাণী বিড়াল অথবা মুরগির দিকেও তাকাই এবং তাকে দেওয়ালের সাথে আটকিয়ে রাখা হয়, তাহলে সে বাঁচার জন্য যতটুকু করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করে থাকে। তাই এটি শুধু শারিয়াগত ভাবেই নয়, বরং মানুষের ফিতরাত থেকেও এ কথা আসা উচিত যে, যখন শত্রু আক্রমণ করে তখন প্রস্তুতি নেয়ার এত সময় পাওয়া যায় না, তখন যার যা কিছু আছে তাকে তা নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করতে হয় এবং প্রস্তুতি নেয়ার কাজ তার সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হয়। এখানে তৃতীয় আরেকটি দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে আমি বলব যা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যারা ময়দানের বাহিরে থেকে এই কথাগুলো বলছেন যে, শত্রু মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য নেই, তারা কিভাবে জানবেন যে শত্রু মোকাবেলা করার জন্য কতটুকু শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন? তারা দূরে বসে কিভাবে তা বুঝতে পারবে, যেখানে কুফ্ফাররা তাদের মিডিয়া, সৈন্য-সরঞ্জাম এবং হলিউডের ফিল্মের মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে তাদের শক্তির ব্যাপারে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যদি কখনো জিহাদের ময়দানে আসত, তাহলে তো তাদের ধারণা হত যে, সত্যিকার অর্থে এ সকল কুফ্ফারদের শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু। এই যে তারা দেখাচ্ছে বড় বড় ট্যাঙ্ক নিয়ে আসছে, বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে আসছে এবং এছাড়াও তারা তাদের আরো অনেক শক্তি-সামর্থ্যের কথা সাধারণ মানুষদের বলে বেড়াচ্ছে, আসলে তাদের বাস্তব শক্তি কতটুকু এবং কতটুকুইবা ক্ষতি পৌঁছানোর ক্ষমতা তারা রাখে আর এর বিপরীতে তাদের ঐ শক্তিশালী জিনিস গুলোকে ধ্বংস করার জন্য এবং সেগুলোকে নষ্ট করার জন্যইবা কতটুকু শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। জিহাদের ময়দানের মধ্যে না এসে তা কখনোই বুঝা যাবে না। মানুষ হাসি-তামাশা করে বলে, ‘ক্লাশিংকোভ দিয়ে মোকাবেলা করতে যাচ্ছে (?)’ আমরা বলব, হ্যাঁ অবশ্য, প্রথমে আল্লাহর সাহায্য, অতঃপর ক্লাশিংকোভের মাধ্যমেই আমরা মোকাবেলা করব। এই ক্লাশিংকোভ ও এ ধরনের সাধারণ অস্ত্র দিয়েই কুফ্ফারদের মোকাবেলা করা সম্ভব। রুশ ঐ হাতি ছিল যার কথা শুনে ন্যাটো পর্যন্ত কাঁপা শুরু করত এবং তার সাথে যুদ্ধ করার বিষয়ে ন্যাটো পর্যন্ত ঘাবড়িয়ে যেত, যেখানে পুরো ইউরোপ এক ছিল। আমেরিকার প্রাণ প্রায় বের হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল, তারপরেও ঠান্ডা যুদ্ধ কখনোই আর গরম হয়ে উঠেনি। মুজাহিদীনরা এই সকল ছোট ছোট অস্ত্র

দিয়ে তাদের সাথে জিহাদ করেছিল এবং আল্লাহ্ ﷻ -র সাহায্যে এবং বরকতে তাদের ধ্বংস করেছিল। তাই আগে আমাদেরকে এটি বুঝা দরকার যে, ময়দানে তাদের মোকাবেলা করার জন্য কতটুকু শক্তি এবং সামর্থ্য প্রয়োজন; এজন্য তাদেরই মত ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ এবং অস্ত্র-সস্ত্রের প্রয়োজন নেই, তবে যদি এসে পরে, তাহলে তা আল্লাহ্ ﷻ -র তরফ থেকে উপহার আর যদি নাও আসে, তাহলে যেভাবে রুশকে ধ্বংস করা হয়েছিল, একইভাবে আল্লাহ্ ﷻ -র ইচ্ছায় আমেরিকাকেও ধ্বংস করা সম্ভব। তবে এখানে আরো একটি বিষয় হচ্ছে, কুফরী শক্তি বহু দিন যাবৎ তাদের মনগড়া একটি ব্যবস্থা সারা দুনিয়া জুড়ে কায়েম করে রেখেছে, জাতিসংঘ এবং তার অধীনে পুরো একটি সিস্টেম কায়েম হয়ে আছে, যা আমেরিকা এবং ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। তাই এই পুরো সিস্টেমকে প্রথমে ধ্বংস করতে হবে এবং যখন এই সিস্টেম ধ্বংস ও শিকড় থেকে নির্মূল হয়ে যাবে তার পরই ইসলামিক খিলাফত ব্যাবস্থা আবার ফিরে আসতে পারবে। তাই এটি তো সাধারণ বুদ্ধিরই একটি দাবী যে, এই প্রতিষ্ঠিত সিস্টামকে ধ্বংস করার জন্য কিছু শক্তি ও সামর্থ্যের তো প্রয়োজন আছেই। যেমনঃ আমেরিকা কোটি কোটি ডলার খরচ করে অনেক উঁচু দু'টি ইমারত টুইন টাওয়ার বানিয়েছিল, যার উপর ১১ই সেপ্টেম্বরে মুজাহিদীনররা আক্রমন চালিয়ে ছিলেন, একে ধ্বংস করতে মুজাহিদীনদের কতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল? -মাত্র ১৯জন মুজাহিদীনের রক্ত। তাঁরা তাদেরই প্লেনগুলোতে উঠেছিল, সেগুলোকেই ব্যবহার করেছিল এবং তা দিয়ে পুনরায় তাদেরই বহুতল বিশিষ্ট ভবনগুলোতে আক্রমন চালিয়েছিলেন। তাই এ কাজ করার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং কত বড় বড় টেকনোলজির প্রয়োজন হয়েছিল? খুব বেশি হলে তাদের তারবিয়া এবং সফরের খরচ যা সর্বোচ্চ মুজাহিদীনদের ব্যয় করতে হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে, আমেরিকার সামুদ্রিক যুদ্ধ জাহাজ, যা নিয়ে তারা কতইনা বড়াই করত, তা ধ্বংস করতে কতটুকু শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। গুটি কয়েক মুজাহিদীন ভাই যাঁরা একটি ছোট্ট স্প্রীড বোর্ড নিয়ে সেখানে ফিদায়ী আক্রমন চালিয়ে ছিলেন আর তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, এটি অনুমান করা যায় যে, একদিকে বিশাল বড় কোম্পানী থেকে বিভিন্ন ধরনের মেশিন দিয়ে একটি নতুন মডেলের ট্যাঙ্ক তারা বানায় আর অপরদিকে একটি প্রেসার কুকারের মধ্যে পাঁচ থেকে দশ কিলো বারুদ ঢেলে একজন সাদা-সিধা আফগানী মুজাহিদ ভাই তাদের ট্যাঙ্কের নিচে রেখে আসে এবং এরপর তা তুলা ধূণা হয়ে যায়। খরচের যদি আপনি হিসাব করেন, তাহলে তা আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখতে পাবেন। তাই যার অন্তর থেকে কুফ্ফারদের ব্যাপারে ভয় উঠে যাবে এবং ময়দানে এসে সে বাস্তবতাকে নিজের চোখে দেখতে পারবে, তখন সে বুঝতে পারবে কুফ্ফারদের ভিত্তিকে ধ্বংস করার জন্য তত বেশি শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হবে না, যতটুকু মানুষ দাবী করে থাকে। আর এ বিষয়ে সব শেষ কথা হচ্ছে, আমরা কোন্ দিন বলেছিলাম যে, আমরা আমাদের শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে কুফ্ফারদেরকে নাস্তানাবুদ করব। শক্তি অর্জন করা তো হচ্ছে আল্লাহ্ ﷻ -র তরফ থেকে আমাদের উপরে একটি দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের বিজয় অথবা কুফ্ফারদের পরাজয়ের সাথে শক্তি অর্জন করার কি সম্পর্ক? আমাদের বিজয় অথবা কুফ্ফারদের পরাজয় তো একমাত্র আল্লাহ্ ﷻ -র ইচ্ছা এবং তাঁরই সাহায্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা না হলে কিভাবে সম্ভব যে, ৩১৩ জন সাহাবী বিজয় পেয়েছিলেন ১০০০ জন কাফেরদের উপরে? আর ঐ একই সাহাবীগণ হুনাইনের যুদ্ধের দিনে ময়দানে নেমেছিলেন এবং মনের মধ্যে সামান্যতম ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, আজ তো আমাদের সংখ্যায় অনেক বেশি, যখন ৩১৩ জন নিয়ে আমরা পরাজিত হইনি, তখন আজ কিভাবে পরাজিত হওয়া সম্ভব? আর তাই আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" [সূরা তাওবাহঃ আয়াত ২৫]

এক রিওয়ায়াতে এসেছে, এমন একটি মূহূর্ত তখন হয়েছিল যে কিছু সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাড়া সবাই পিছনে যেতে শুরু করেছিলেন।

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

"বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে।" [সূরা আলে-ইমরানঃ আয়াত ১২৬]

তাই আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহ্ ﷻ -র তরফ থেকেই আসে। মহান আল্লাহ্ ﷻ -র সুন্নাহ্ হচ্ছে খুবই আশ্চর্য সুন্নাহ্।

﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾

"দেশে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার।" [সূরা কাসাসঃ আয়াত ৫]

আস্-সাহাবঃ মুজাহিদীনদের ব্যাপারে দ্বীনদার অনেক লোকই এই দোষারোপ করে থাকেন যে, ইমারাতে আফগানিস্তানের মধ্যে যদিও সারা দুনিয়ার মুজাহিদীনদের আশ্রয়ের জায়গা পাওয়া গিয়েছিল এবং প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য মারকাজ মিলে ছিল, কিন্তু এমন একটি সময়ের মধ্যে কুফ্ফারদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয়া হল, যখন মুজাহিদীনরা তেমন কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে নি। তাই আমেরিকার উপরে ১১ই সেপ্টেম্বরে যে আক্রমন করা হয়েছিল তা কি সঠিক সময়ের পূর্বে এবং পুরো প্রস্তুতি গ্রহণের আগে হামলা করে কী আমেরিকাকে যুদ্ধের ময়দানে আসার জন্য দাওয়াহ্ দেয়া হল না? অর্থাৎ, এর জন্য ক্ষতি হিসেবে দেখানো হয় যে তাদের কাছ থেকে ইমারাত-ই ইসলাম চলে গিয়েছিল।

উস্তাদ আহমেদ ফারুকঃ দেখুন! এই ধরনের প্রশ্ন যারা করে থাকেন, তাদের কথায় মনে হয় যেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের সময়ের কথাগুলো তাদের এখন আর মনে নেই। ইহুদীরা কি ফিলিস্তিনের ভেতরে ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে ঢুকে ছিল? ভারত কি কাশ্মীরে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে প্রবেশ করেছিল? আমেরিকা সারা দুনিয়া ব্যাপী মুসলমানদেরকে গোলাম বানানোর জন্য এবং তাদের মনগড়া শাসন ব্যবস্থা, অর্থাৎ গাইরুল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সরকারগুলোকে নিযুক্ত করে রেখেছিল, তা কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে প্রকাশ পেয়েছিল? আমেরিকা সোমালিয়ার মুসলমানদের উপরে যে হামলা চালিয়ে ছিল তা কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে ঘটেছিল? বসনিয়াতে মুসলমানদের সাথে যে নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়েছিল, যেখানে এক একটি শহরের মধ্যে হাজার হাজার মুসলিমদেরকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল, পুরো ইউরোপ তখন তার তামাশা দেখ ছিল, তা কি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে হয়েছিল? প্রকৃতপক্ষে, এটি কোন প্রশ্নই নয়, কারণ

আমরা যদি ১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের সময়ের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো এই উম্মত দুনিয়ার কোণায় কোণায় তখন অপমানিত এবং মার খাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন অবস্থানে ছিল না। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা তো ঐ সকল ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল -এর মানে তারা সমুদ্রের প্রচন্ড স্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, প্রবল বেগে আসা বাতাসের দিককে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। ঐ ১৯জন যুবকের রক্তের মধ্যে আল্লাহ্ ﷻ এতোটাই বরকত দান করেছিলেন যে, এতদিন যাবৎ অপমান ও জিল্লতির যে সূধা আমাদেরকে পান করানো হচ্ছিল, প্রথম বারের মত ঐ একই সূধা পান করার স্বাধ তারা পেয়েছিল। প্রথমবারের মত কুফ্‌ফারদের উপর তাদের নিজেদের ভূমিতেই এমন মার পরেছিল যে, তারা কখনো তা স্বপ্নেও কল্পনা করে নি আর পরে তা বন্ধ হয়ে যায় নি, বরং তা ধারাবাহিকভাবে চলতে শুরু করে। এর পরে ৭ই জুলাই তে হয়েছিল, মাদ্রিদেও হয়েছিল ও এখন পর্যন্ত তা জারি আছে এবং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় তা ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এই ঘটনা তো উম্মতকে খিলাফতের পতনের পর প্রথম বারের মত সাহস জাগিয়েছে, যাতে তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়, হ্যাঁ, তাদের এতটুকু সামর্থ্য আছে যে, তারা তাদের শত্রুদের চোখের সাথে চোখ মিলিয়ে তাকাতেও পারে, তাদের গর্দানে হাতও রাখতে পারে এবং তাদের ভূমিতে গিয়ে তাদেরকে হামলাও করতে পারে এবং একইভাবে, যে খিলাফত ব্যাবস্থা এই উম্মত থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, তা আবার জিহাদের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তাই ১১ই সেপ্টেম্বর পরিস্থিতিকে খারাপ করে দেয় নি, বরং খারাপ পরিস্থিতির উপরে আশার একটি আলো জাগিয়েছে এবং প্রথমবারের মত কাফেরদেরকেও তাদের কর্মের জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়েছে। এটি তো ছিল একটি দিক , এর আরেকটি দিক হল, আমেরিকার মত একটি সুরক্ষিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার মত দ্বিতীয় আর কোন পন্থা তখন ছিল না। আমেরিকার মত এত বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রকে এভাবেই ধ্বংস করা সম্ভব ছিল, যাতে সে নিজের পায়ে চলে আমাদের মুসলিম ভূমিতে আসবে। কারণ তারা সেখানে বসে বসে রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে অর্থাৎ তার নিযুক্ত দালালদের দ্বারা আমাদের উপর কাজ করে যাচ্ছিল। এই প্রশ্নটি যদি ১১ই সেপ্টেম্বরের এক-দেড় বছর পর করা হত, তাহলেও ধরা যেত যে এটি একটি যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু আজ ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে আট-নয় বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, তাই এখন আর এই প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই, কারণ আজ এতদিন পরে উম্মত দেখে নিয়েছে যে, লাভ এই উম্মতের বেশি হয়েছে নাকি ক্ষতি? এই আট-নয় বছরে আমেরিকার কোমড় ভেঙ্গে গিয়েছে। আজ সে ইরাক থেকে পালানোর সময়সীমা নির্ধারণ করে ফেলেছে, আফগানিস্তান থেকে পালানোর জন্য রাস্তা খুঁজে বেরোচ্ছে আর তার কোমড় এমন ভাবেই ভেঙ্গেছে যে, তার সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এমন শক্তভাবে কখনোই কোমড় ভাঙ্গে নি। আল্লাহ্ ﷻ -র নেয়ামত এবং তাঁরই ইচ্ছায়, সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমেরিকা এতদিন মানুষের সামনে তার দাজ্জালী চেহারার উপর মানব দরদীর একটি মুখোশ পরিধান করেছিল - মুসলমানদের মধ্য থেকেও অনেক মানুষই তাদেরকে রুশদের থেকে ভাল মনে করত- আল্লাহ্ ﷻ তাদের চেহারা থেকে সেই মুখোশ আজ সবার সামনে উম্মোচিত করে দিয়েছেন। গোয়েন্তানামো বে তে যা কিছু হয়েছে এবং আবু গারিব কারাগারের ভেতরে যা কিছু ঘটেছে এ সব কিছুর মাধ্যমে তার যে হিংস্র চেহারা রয়েছে, তা দুনিয়ার সবার সামনে জিহাদের বরকতের কারণে আল্লাহ্ ﷻ নিয়ে এসেছেন । তাই, আজ ১১ই সেপ্টেম্বরের বরকতের কথা বলে শেষ হওয়ার নয়, এর পর থেকে শুধু আমেরিকাই নয়, পুরো পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের ন্যাটো বাহিনীর দিন শেষ হতে দেখা যাচ্ছে। আর একই ভাবে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্ ﷻ এই উম্মতকে তার আক্বীদার উপর আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। "আল্লাহ্ ﷻ -র জন্য বন্ধুত্ব ও আল্লাহ্ ﷻ -র জন্যই শত্রুতা" ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদাটি প্রায় কয়েক শতক যাবৎ হারিয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ্ ﷻ -র ইচ্ছায় এই আক্বীদা আবারও ফিরে এসেছে এই উম্মতের নিকটে। আর আল্লাহ্ ﷻ সব স্তরের মানুষদেরকে অর্থাৎ আহলে ইলম, সাধারণ মানুষ, শাসকগোষ্ঠী সবাইকে দু'টি দলে ভাগ করেছেন। যেমনটি শেষ জামানার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, মানুষ দু'টি দলে বিভক্তি হয়ে যাবে, একটি হবে ঈমানদারদের দল যার মধ্যে নিফাক্বীর কোন গন্ধ থাকবে না, আর দ্বিতীয়টি ঐ নিফাক্বীদের দল হবে যাদের মধ্যে ঈমানের কোন গন্ধ থাকবে না। তাই যার

কাছে দু'টি চোখ আছে তার কাছে এ বিষয়টি পরিস্কার যে, পুরো দুনিয়া আজ দু'টি দলে বিভক্তি হয়ে গিয়েছে। আর এ বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে কুফরের ইমাম অর্থাৎ বুশের সেই ভাষণ যেখানে সে বলেছিল, তোমরা হয় আমাদের পক্ষে, না হয় সন্ত্রাসীদের (মুজাহিদীনদের) পক্ষে। তাই পুরো দুনিয়া দু'টি দলে বিভক্তি হয়ে গিয়েছে। এটি এত বরকতময় ঘটনা ছিল যে, এত দিন যাবৎ কুফরের বাহিনীরা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে এই উম্মতের আক্বীদার মধ্যে যে ভেজাল মিশ্রণ করে দিয়েছিল, বন্ধু এবং শত্রুর পরিচিতিকে তারা ভুলিয়ে দিয়েছিল, আল্লাহ্ ﷻ **১১**ই সেপ্টেম্বরের বরকতের ফলে ঐ সকলের ভ্রান্ত আক্বীদাকে তুলে ধরেছেন, জিহাদ থেকে বিমুখ জাতিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। আর বাকী রইল ইমারতে ইসলামীর কথা, ইনশাল্লাহ্ ইমারতে ইসলাম ফিরে আসতে আর বেশি দিন বাকি মনে হচ্ছে না। আল্লাহ্ ﷻ -র রহমতে আমরা এখন থেকেই আফগানিস্তানের জুনুবী এলাকাগুলোতে দেখতে পাচ্ছি যে, সেখানে মুজাহিদীনদের নিয়ন্ত্রণ চলে আসছে, সেখানে মোল্লা মুহাম্মদ উমারের (আল্লাহ্ ﷻ তাকে হিফাজত করুন) পক্ষ থেকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে এবং কাজীও নিযুক্ত করা হয়েছে, যার কাছে জন সাধারণ বিচার ফায়সালার জন্য যায়। তাই আমি বলব, এখন থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার পালানো এবং ইসলামিক ইমারাত কায়েম হওয়া শুরু হয়ে গেছে। যেমন এখন তাজা খবর হচ্ছে, হেলমেন্দে তারা সর্ব শক্তি দিয়ে হামলা করা শুরু করেছিল, কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই বৃটিশ সেনা বাহিনীর এতটাই ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যেই হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে -তারা সামনে আগে বাড়বে কি বাড়বে না অথবা তাদের সেনা বাহিনীকে এখান থেকে ফেরত নিয়ে যাবে কিনা। তাই আমরা আশা করি, আফগানিস্তানে পূর্বের চেয়েও আরো বেশি শক্তি এবং জায়গা নিয়ে ইমারতে ইসলাম আবার ফিরে আসবে, ইনশাল্লাহ।

আস্-সাহাবঃ আল্লাহ্ ﷻ আপনাকে অনেক উত্তম প্রতিদান দান করুন। আজ আমাদের আলোচনার প্রথম অংশ এখানেই শেষ হচ্ছে এবং আমরা উস্তাদ আহমেদ ফারুকের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার সাথে বিদায়ের অনুমতি চাইবো। আল্লাহ্ ﷻ -র কাছে আমরা প্রার্থণা করছি, যেন তিনি আমাদের এই সকল প্রচেষ্টার উপরে তাঁর বরকত দান করেন। আমিন॥

আপনি যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চানঃ

আপনি যদি ইসলামী বইয়ের অনুবাদ, এডিটিং, স্ক্যানিং, টাইপিং ও ইসলামীক অডিও-ভিডিও এডিটিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর কাজে আমাদের সাহায্য করতে চান তবে নিচের যেকোন ই-মেইলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আমরা সবাইকে "আস-রার আল-মুজাহিদীন" সফটওয়্যারটি[১] ব্যবহারের[২] জন্য অনুরোধ করবো। এই সফটওয়্যারটি ব্যবহারের সময় *তৃগুতের*[৩] ইন্টেলিজান্স্ কর্মীর[৪] নজরে পড়া থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের "পাবলিক কী"[৫] নিচে দেওয়া হলঃ

#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---
pyHwPx9G32y5PcoLB/XCNP1kyOmdi0MrXgOINclzrQFyjDaceC
GsEdf6wbYQaF1XyNOX2rPpxiMCu4jT2OWoiQB3ZEWm/Nzhfv2Z
wub7c6QwPRNbzrBeRWPAeOcMZawdXd/XUf/lfTctDdCqObgxAu
q5xzhwgNjy4kCAL74JMW6ZP3kfrS2jSkQOrCD90U5TXRz42b+Y
Cbngov1exBBOWZJHhDwbFUwYXGh6qiXLX+AFLFSsoPC2ur1kDb
UFBPM4fB5N+iH1eVK0tXJTOGm/Bc2u2e58lJTkkDM8IMWHA755
pCpvGQDx8C6rUc7LMLXaxtEJOfWqdc2SwfcHCKxkQ8L0mDrot9
butmWI1n0HvzT1mEf/26LU0MqfWzHop/wE0EGYRn4AUdvnQ65Z
/B6vD4pDeLokQdYBf9q14c0cIqHsVe1ZB5aRMn1q6hrExogxQC
zm1zOp+/SAR3CkHUt5wJVuf5V9jZFWfSSSsgI3RyTKAM7zNL5z
qG8qtWoSGxG09VbHHmc8t9ib1wf2sl2M/oxFWerABR5twlNhG7
AN3MUJn6SqrhGWb67gIJt5Pe8ai1Q=

#---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit---

tibyan_bangla@yahoo.com
tibyan_bangla @hotmail.com
tibyan_bangla @fastmail.co.uk

---

[১]ডাউনলোড লিংকঃ http://www.mediafire.com/?jk6bcxit2ait04r#1

[২]ব্যবহারের ম্যানিউআল লিংকঃ http://www.mediafire.com/?o6e66s4c5zwt60p

[৩]তৃগুত শব্দটি ব্যাপক। ইমাম মালিক (রঃ) বলেছেনঃ"*আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত বা উপাসনা করা হয় সেই তৃগুত।*" উপাস্য যদি তার প্রতি উপাসনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তবে সে তৃগুত হবে। চাই কি তা দেবতা বা নেতা, অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের বাইরে অন্য কারো অনুসরণই হোক, ঐসবগুলোকেই তৃগুত বলা হবে। আর এ তৃগুত -এর সংখ্যা অত্যধিক; তবে প্রধান-প্রধান তৃগুত হলো পাঁচটিঃ এক: শয়তান, দুই: আল্লাহর আইন (হুকুম) পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক যেমনঃ ওবামা, ব্রাউন, জারদারি, জিল্লুর রহমান ইত্যাদি। তিন: আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ (আইনের) হুকুমের বিপরীত হুকুম (বিচার-ফায়সালা) প্রদানকারী, যেমনঃ সংসদ সদস্য (এম.পি)। চার : আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন গায়েবের খবর রাখার দাবিদার যেমনঃ গনক,জ্যোতিষি। পাঁচ : আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং সে এই ইবাদতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, যেমনঃ ভন্ড পীর, মাজারের খাদেম যারা মুরিদদেরকে নিজেদের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য বলে। মনে রাখা দরকার কোন মানুষ তৃগুতের উপর কুফরি করা ছাড়া ঈমানদার হতে পারেনা।

[৪]CIA, FBI (আমেরিকা) NSI, RAB, DB (বাংলাদেশ) ইত্যাদি।

[৫] পাবলিক কীলিংকঃ http://www.mediafire.com/?t26a2vznjhvbokd